বাঙালীর বানান বিভ্রান্তি

বাংলা বানান নিয়ে অনাচার বহুকাল ধরেই চলছে। মাত্র কয়েকজন মানুষের অবৈজ্ঞানিক, পার্ট- টাইম ও হাফ- হার্টেড চর্চা ও বিশ্লেষণ সাধারণভাবে বিদেশী লেখক, ভাষাতত্ত্ববিদ ও ব্যাকরণকারদের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত। যাঁরা অতীতে এই কাজ করেছেন তাঁরা পূর্বজ ঋষি, সমাজ তাদের অস্বীকার করুক এটা অভিপ্রেত নয়। কিন্তু শত বৎসরের ভ্রান্ত উদাহরণগুলিকে রিভিজিট করার সময় এসেছে। তা করার জন্য অন্ততঃ হাজারখানেক লোকের কন্‌সিডার্‌ড্ ওপিনিয়ন দেওয়ার মত যোগ্যতা থাকা দরকার। আর দরকার এতাবৎ বঙ্গসন্তান ও বিদেশীদের রচিত বা চর্চিত সমস্ত বই, প্রবন্ধ ও বিষয়ের কম্পিউটার সাধ্য আর্কাইভ্‌স্। প্রতিটি প্রস্তাবনা, সিদ্ধান্ত ও সম্ভাবনা কম্পিউটার অ্যানালিসিস দ্বারা মূল্যায়িত হয়ে তবে উত্তরণ পর্বে স্থান পাবে। বঙ্গদর্শনের বাংলা ভাষা বিভাগে এই শিক্ষিত মানব মাস্ ও তথ্যের ভান্ডার গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হচ্ছে। দেবপ্রসাদ ঘোষের মতামত বাংলা ভাষা চর্চার স্টাইলের আর্বিট্রারী, অ্যাড-হকিজম্ ব্যাপারটিকে প্রকাশ্যে তুলে এনেছে।

বাংলা বানান ও দেবপ্রসাদ ঘোষ

বাংলা ভাষায় বানান একটি বহুকালের বিতর্কিত বিষয়। ১৯৩০ দশকের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেছিলেন বাংলা বানানের কতগুলি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে, যা সবাই মেনে চলে। সেই সময়কার উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই কাজের ভার দিয়েছিলেন পরিভাষার জন্য যে কমিটি ছিল, তার উপর। ১৯৩৬ সালের মে মাসে এই কমিটি বাংলা বানানবিধির প্রবর্তন করেন। কিন্তু বানানের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা এক কথা, কিন্তু সেই নিয়ম সবাইকে মানতে বাধ্য করা অন্য ব্যাপার। এই বানানের বিধি অনেকেরই মনঃপুত হয় নি। তীব্র বিতর্ক সেই সময়ে হয়েছিল – যার পুরোভাগে ছিলেন দেবপ্রসাদ ঘোষের মত ব্যক্তিত্ব। তবে অনেক বাদ–প্রতিবাদের পরেও মোটামুটি ভাবে এই বানানবিধি সত্তর বছর ধরে চলেছিল। মোটামুটি ভাবে এইজন্য যে, সবাই (ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান) এই বিধি সমানভাবে মানেন নি।

BANGADARSHAN.COM

এরমধ্যে দেশ ভাগ হয়েছে। ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশে (সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তানে) বাংলা আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৯০ সালে বাংলা একাদেমি যে বাংলা বানান-বিধি প্রবর্তন করল, সেটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬ সালের নির্দেশিত বিধির অনুরূপ। ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অফিসের কাজে বাংলা ব্যবহার শুরু করে। ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করে যে বাংলা ভাষার সংস্কার (ব্যাকরণ, বানান, স্ক্রিপ্ট, ইত্যাদি) হওয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। আকাদেমি প্রবর্তিত বাংলা বানান বিধি থেকে সৃষ্টি হয়েছে আকাদেমি বানান অভিধান। এই ধরণের উদ্যোগে সবসময়েই কিছু ব্যক্তির উৎসাহ কাজ করে। কেউ কেউ সেটাকে মাতব্বরি মনে করে বিরক্ত হন। বাংলায় একটি স্ট্যাণ্ডার্ড বানানবিধি সবারই কাম্য। মুশকিল হল নানা মুনির নানা মত থাকায় এটিকে গড়ার সর্বজনগ্রাহ্য সূত্র কোনও দিনই আবিষ্কৃত হবে না। তার ওপর যাঁদের ইস্কুল-কলেজের বাংলা পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে না, তাঁরা ইচ্ছেমত বানানে বাংলা লেখা চালিয়ে যাবেন, তাঁদের ঠেকাবে কে? শেষপর্যন্ত বানান-বৈচিত্র্যই হয়ে থাকবে বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য !

১৯৩৬ সালে বানান সংস্কারের সময়ে দেবপ্রসাদ ঘোষ যুক্তি-তর্ক দিয়ে মূলতঃ দুটি প্রাথমিক প্রশ্ন তুলেছিলেন, সে-দুটি এযুগের সংস্কারের ক্ষেত্রেও অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। এক হল, ভাষা চলমান, শব্দের উচ্চারণ সময়ের সঙ্গে পাল্টায়। তাই শুধু উচ্চারণ বা ফোনেটিক-এর ভিত্তিতে বানানের রূপ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। দুই, বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের যে বন্ধন, সেটাকে ছিন্ন করে – তার রীতিনীতি উপেক্ষা করে বাংলা বানানের সংস্কার উচিত নয়। এ নিয়ে দেবপ্রসাদ শুধু রাজশেখর বসু বা সুনীতি চট্টোপাধায়ের মতো পণ্ডিতদের নয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন। নিঃসন্দেহে ওঁর অবস্থান ছিল রক্ষণশীল, কিন্তু ওঁর বক্তব্যবিষয় উপেক্ষণীয় ছিল না। বাংলা ভাষা ও বানান বইটিতে এ বিষয়ে ওঁর বক্তব্য এবং রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিতদের সঙ্গে ওঁর চিঠিপত্র স্থান পেয়েছে, সেই বই থেকে একটি প্রবন্ধ অবসর-এ দেওয়া হল। প্রবন্ধটি ছাপার অনুমতি দেওয়ার জন্য দেবপ্রসাদের পুত্র শ্রী অমিতাভ ঘোষকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রসঙ্গতঃ দেবপ্রসাদ ছিলেন গণিতজ্ঞ। গণিতশাস্ত্রে অনার্স পরীক্ষায় তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পাওয়া নম্বরের যে রেকর্ড ছিল, সেটিকে ভাঙ্গেন। তিনি আইন পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীকালে দেবপ্রসাদ রিপন কলেজে পণিতের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে অনেক বছর কাজ করেছিলেন এবং বীজগণিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির উপর জনপ্রিয় পাঠ্যবই রচনা করেছিলেন। ১৯৪১ সালে তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং সেখান থেকে ১৯৫০ সলে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি শ্যামাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত জনসংঘে যোগ দেন

১৯৫২ সালে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। বেশ কয়েক বছর তিনি জনসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন। ১৯৮৫ সালে ৯১ বছর বয়সে ওঁর মৃত্যু হয়।

বানান কমিটিতে ঘন্টা কয়েক

তখন সবে চন্দননগরের সাহিত্য সম্মিলন সারা হইয়াছে। খবর পাইলাম যে তথাকার বাঙ্গালা বানান আলোচনার বৈঠকে বক্তৃতাদির ফলেই বোধ করি বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান -কমিটি তিনজন ভদ্রলোককে কমিটিতে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন - ডাঃ শহীদুল্লা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু এবং আমি। অবিলম্বেই কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে যথারীতি একখানি আমন্ত্রণলিপি হস্তগত হইল। আমিও যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম, এবং বানান -কমিটির পরবর্ত্তী অধিবেশনেই যোগদান করিব বলিয়া স্থির করিলাম।

অধিবেশনের দিন পৌঁছিতে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল ----- উপস্থিত হইয়া দেখি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহশয় আসিয়াছেন; ইনি রসায়নের এম.এ., খ্যাতনামা রস-সাহিত্যিক "পরশুরাম", বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্ক্সের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার, "চলন্তিকা"-নামক বাঙ্গালা অভিধানের সম্পাদক, এবং বর্ত্তমানে পরিভাষা-কমিটি তথা বানান -কমিটির সভাপতি। আর উপস্থিতের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ইনি পদার্থ-বিজ্ঞানের এম.এ., প্রেসিডেন্সী কলেজে উক্ত বিষয়ে ডেমনস্ট্রেটর, বোলপুর বিশ্বভারতীর সেক্রেটারী ও গোলদীঘী বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান -কমিটির সেক্রেটারী, এবং এই উভয় বিশ্বের ভার যুগপৎ তাঁর স্কন্ধে আপতিত হওয়ায় স্বভাবতই চাল কিছু গুরুগম্ভীর ; আর ছিলেন ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায় ও ডাঃ শহীদুল্লা, উভয়েই পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিক, একজন কলকাতায় এবং অপরজন ঢাকায় অধ্যাপনা করেন। এই চারিজনকেই বিশেষ কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত দেখিলাম, যেন সভায় মুরুব্বি মতন। আরও অনেকে ছিলেন; সকলের নাম মনে নাই. কিন্তু তাঁহাদিগকে মুখব্যাদান- পূর্ব্বক বিশেষ উচ্চবাচ্য করিতে দেখিলাম না; বোধ করি সভাবর্ধন করাই উঁহারা যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকিবেন।

আমি যখন পৌঁছিয়া আসন গ্রহণ করিলাম, তখন শুনি আলোচনা চলিতেছে "বৌ" সম্বন্ধে; অর্থাৎ ডাঃ শহীদুল্লা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা শব্দে ঐ-কার ঔ-কার আর থাকিবে না, তৎস্থলে অই, অউ, এই প্রকার লিখিতে হইবে; যেমন, "বৌ"-

এর স্থলে ''বউ'', ''দৈ''-এর স্থলে ''দই'', ইত্যাদি। আমি চুপ করিয়া আলোচনা শুনিতে লাগিলাম; ভাবিলাম যে, ইদানীং বড় বেশি বক বক করিয়া বক্‌তিয়ার খিলিজী দুর্নামটি অর্জ্জন করিয়াছি, তাই কিয়ৎকাল বাক্‌সংযম পূর্ব্বক পণ্ডিতগণের গবেষণাই শোনা যাক। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর শুনিলাম শহীদুল্লা সাহেব বলিলেন, ''কি বলেন সুনীতিবাবু, তাহলে এ বিষয়ে general agreement হল ত?''

সুনীতিবাবু বলিলেন, ''হ্যাঁ, হ্যাঁ।''

সভাশোভনকারী যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহারাও ''মৌনং সম্মতিলক্ষণং'' জ্ঞাপন করলেন। আমি তো মনে মনে প্রমাদ গণিলাম, ''বৌ' যে যায় যায়। তাই অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, '' কি বিষয়ে আপনাদের general agreement হল?''

সুনীতিবাবু আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন। আমি বলিলাম, ''সর্ব্বনাশ! এমন কাজও করবেন না। শেষকালে আপনারা বৌ-বর্জ্জন আরম্ভ করলেন? এ অতি dangerous! কেন, 'বৌ' চলবে না কেন শুন্‌তে পাই কি?''

সুনীতিবাবু বলিলেন, দেখুন বৌ-এর চাইতে বউ-ই দেখতে ভালো।'' আমি নাছোড়বান্দা হইয়া বলিলাম, ''মশাই, দেখতে ভাল হলেইত চলবে না, তালাক দেবার আগে বৌ-য়ের দোষটা কি তা ত বুঝিয়ে বলতে হবে। হ্যাঁ, স্বীকার করি বাংলাতে বৌ-বউ দুপ্রকারই চলছে। কিন্তু আপনারা না phonetics-বাদী? Phonetics-ই যদি দেখতে যান, তাহলে কিন্তু বৌ-ই ঠিক, কারণ ওর উচ্চারণ diphthongal - ওটা monosyllabic - এক নিঃশ্বাসে 'বৌ' বলে আমরা উচ্চারণ করি, ব-উ' বলে di-syllabic ভাবে আলাদা আলাদা উচ্চারণ করিনে।''

সুনীতিবাবু বলিলেন, দেববাবু, ও কথা বললে চলবে কেন? ওরকম diphthong বাংলা ভাষায় ঢের আছে, খাই, যাই, নেই, যেই, শুই, ধুই, কেউ, কেউ, ঘেউ ঘেউ, হাঁউ মাঁউ খাঁউ, ইত্যাদি। আমি গুণে দেখেছি যে ওরকম ছাব্বিশটা diphthong বাংলায় পাওয়া যায়।''

BANGDARSHAN.COM

আমি বলিলাম, ''দেখুন , আপনারা প ণ্ডিত লোক, philologist; আপনারা পা রেনতো সেই ছাব্বিশটা dipthong-এর ছাব্বিশটা phonetic symbol বার করুন না। তা বলে যে দুটো আমাদের রয়েছে সে দুটো মাঠে মারা যাবে, এর মানে কি?''

সুনীতিবাবু তখন বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে বিকল্প হোক।''

আমি বলিলাম, ''তা বেশ, আপনাদের যা ইচ্ছে – বিকল্পই করুন। সঙ্কল্পতো কোন বিষয়েই বিশেষ দেখতে পাচ্ছিনে আপনাদের। কিন্তু একটা কথা বলি। দুটো একটা উদাহরণের ওপরই যেন কোন বিষয়ে generalize করে বসবেন না। হ্যাঁ, 'বৌ' 'দৈ' এই দুটি শব্দের 'বউ' 'দই' রূপও চলতি আছে বটে; কিন্তু আপনারা general agreement করে যে ফতোয়া দিতে যাচ্ছিলেন যে, অসংস্কৃত সব বাংলা শব্দেই ঐ-কার ঔ-কার বর্জ্জন করতে হবে, তার শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায় তা একবার ভেবে দেখেছেন? এই ফতোয়া মানতে গেলে যে, অতঃপর ফুলের ওপর শুধু 'মউমাছিরা' গুঞ্জন করবে, কুকুরগুলো শুধু 'ভউ ভউ' করে ডাকবে, ছেলেরা শুধু 'দউড়া দউড়ি' করবে, আর রাস্তার 'চউমাথায়' 'হই হই রই রই' শুনে পুলিশ 'ফউজ' তাড়া করে আসবে। দেখুন, ভাষাগত কোন রুলিং * জারী করতে গেলে একটু ভেবেচিন্তে করা দরকার – implication গুলো একটু বিবেচনা করা দরকার – দুটো একটা instance-এর ওপর induction চলে না।''

এই সজোর ওকালতীর ফলে যাহোক ''বৌ'' ত কোনমতে টিঁকিয়া গেল।

তখন শহীদুল্লা সাহেব আরেক দফা প্রস্তাব ঝাড়িলেন। তিনি বলিলেন যে, যে সব অসংস্কৃত বাঙ্গালা শব্দের আদ্যক্ষরে ''ক্ষ'' আছে, তৎস্থলে ''খ'' হউক; এবং নিজে দৃষ্টান্ত দিলেন, যেমন ক্ষ্যাপা, ক্ষেত, ক্ষুর, ইত্যাদিকে অতঃপর লেখা হউক খ্যাপা, খেত, খুর ইত্যাদি। সুনীতিবাবু আবার ইহার উপর amendment আনিলেন যে, 'লক্ষ্ণৌ''-কেও ''লখ্নৌ'' (note – খ ও ন-এর যুক্তাক্ষর, যেটা আমাদের ফণ্টে নেই) ভাবে লেখা হউক। কেহ কেহ আপত্তি করিলেন, কারণ ঐ নগরের নামটি রামায়ণের লক্ষ্মণের সঙ্গে জড়িত। ভাষাতাত্ত্বিকগণ সে কথা মোটে আমলের মধ্যেই আনিলেন না। রামায়ণ। সে আবার একটা ঐতিহাসিক authority নাকি! কৈ, মহেঞ্জোদড়োর কোন ভাঙ্গা বাসনের গায়ে কি লক্ষ্মণের কোন ফটো পাওয়া গিয়াছে? অতএব লক্ষ্মণ বাতিল; সুতরাং ''লখ্নৌ''।

BANGLADARSHAN.COM

আমি আবার সভয়ে বলিলাম, ''আচ্ছা শহীদুল্লা সাহেব, 'ক্ষ; কে তাড়িয়ে আপনি 'খ' আমদানী করতে চান কেন বলুন ত? প্রথমতঃ ত ক্ষ-এর ধ্বনি ঠিক খ-এর ধ্বনি নয়, ওর উচ্চারণ অনেকটা ক্‌খ-এর মত। দ্বিতীয়তঃ, যে শব্দগুলো আপনি উল্লেখ করলেন, তাতে যদি ক্ষ থাকে তাহলে শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি সহজেই বোঝা যায়; যেমন 'ক্ষ্যাপা' - 'ক্ষিপ্‌' ধাতুর থেকে এসেছে; 'ক্ষেত' - ' ক্ষেত্র'-এর থেকে এসেছে। বেশ সহজ এবং সুন্দর। 'ক্ষেত'-এর বদলে 'খেত' লিখলে, কথাটা কোত্থেকে এসেছে তাই মালুম করা শক্ত হবে। আর দেখুন শহীদুল্লা সাহেব, আপনি বল্লেন 'ক্ষুর'। হ্যাঁ, 'খ' দিয়ে এক রকম 'খুর' আছে বটে কিন্তু তা গরুর পায়ে থাকে, তা দিয়ে দাড়ি কামানো চলে না।

এই কথায় শহীদুল্লা সাহেব যেন একটু impressed হইলেন মনে হল; কারণ তিনি তাঁহার নিবিড় শ্মশ্রুদামের মধ্যে ঘন ঘন করসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। আমি উৎসাহিত হইয়া বলিলাম, ''আর দেখুন, আপনি বল্লেন না, অসংস্কৃত শব্দে এই রকম সংস্কার করতে হবে? এবং বল্লেন 'ক্ষুর'। 'ক্ষুর' কিন্তু একেবারেই সংস্কৃত শব্দ - উপনিষদে এর প্রয়োগ আছে - 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।''

তখন ডাক্তারসাহেব, ''তাই ত, তাই তো, ওটা সংস্কৃত?'' বলিয়া আমতা আমতা করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, ''দেখুন ডাক্তার সাহেব, আর যাই করুন, ক্ষুর নিয়ে আর নাড়াচাড়া করবেন না।''

এবার সুনীতিবাবু এক প্রস্তাব তুলিলেন - বোধ করি শহীদুল্লা সাহেবকে একটু অপ্রতিভ দেখিয়া। তাঁহার প্রস্তাব এই যে, ''যদ্‌'' শব্দজ যাবতীয় শব্দ বাঙ্গালাতে ''জ'' দিয়া লেখা উচিত; অর্থাৎ যে, যাহা, যিনি, যেমন, ইত্যাদিকে লিখিতে হইবে জে, জাহা, জিনি, যেমন, ইত্যাদি।

প্রস্তাব শুনিয়া ত আমার চক্ষু চড়ক-গাছ! সুনীতিবাবু বলেন কি? প্রথমটাতো প্রত্যয়ই হইল না। শেষে মনে পড়িল এপ্রকার মৌলিক প্রস্তাব আনয়ন অসম্ভব নহে; কারণ ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং হিন্দু-সভার বিশিষ্ট সভ্য হইলেও উনি কেমালিস্ট অর্থাৎ Roman script -এর পাণ্ডা, সুতরাং অবশ্যই এবংবিধ রোমাঞ্চকর প্রস্তাব উঁহার নিকট হইতে প্রত্যাশা করিতে পারি। আমি তবুও সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, যে, 'জ' দিয়ে লেখা হবে?

উত্তর হইল, ''প্রাকৃতে তাই হয়।''

এবার আমি উত্তেজিত হইয়া গেলাম; বলিলাম, ''প্রাকৃতে কি হয় তা নিয়ে ত কথা হচ্ছে না – এটাতো philology ক্লাস নয়। কথা হচ্ছে বাংলা নিয়ে বাংলা ভাষাও তো দুশ পাঁচশ বছর ধরে চলে আসছে – বাংলায় শিষ্টপ্রয়োগে কি ব্যবহার হচ্ছে সেইটেই ত দেখতে হবে। আর তাছাড়া ও শব্দগুলো যে সংস্কৃত 'যদ্' শব্দ থেকে এসেছে তার ত সন্দেহ নেই। যদি প্রাকৃতে সংস্কৃত form–টাকে vulgarize করেই থাকে, এবং বাংলাতেও যদি মূলের শুদ্ধ form–টাই অবলম্বিত হয়ে থাকে, তবে কি জন্যে আমরা সেই মূলানুগত শুদ্ধ form ত্যাগ করে vulgarized form –টাই লুফে নেব?''

সুনীতিবাবু বলিলেন, ''তা বাংলার কথা বলছেন? বাংলার পুরণো পুঁথিতেও আপনি এন্তার জ–ওয়ালা যে, যাহা, ইত্যাদি পাবেন।''

আমি উত্তর দিলাম, ''বটে! এই কথা? আপনিও বহু অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের চিঠিতে দেখতে পাবেন যে, 'অশেষপ্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন' লিখিতে 'অশেষ' কথাটি 'অসেস' ভাবে লেখা হয়েছে। আর আদালতের নথীপত্র দেখেছেন কোন দিন? তাতে দেখবেন 'পিতা' কথাটি ভ্রমক্রমেও তাতে ওভাবে লেখা হয় না; বরাবর 'পীতা' লেখা থাকে। দেখুন, ভাষা ত fool-proof করা সহজ নয়। কতগুলো fool যদি না জেনেশুনে কতগুলো blunder করে, তাদ্বারা ভাষার বানান regulated হয় না। হ্যাঁ, আরেকটা কথা। প্রাকৃতের কথা বলছিলেন। তা প্রাকৃত ত আর একরকম নয় – বিভিন্ন প্রাকৃতে বিভিন্ন রকম প্রয়োগ। সত্যি বটে মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রাকৃতে 'য'– স্থানে 'জ' হয়; কিন্তু মাগধী প্রাকৃতে – যে প্রাকৃতের সঙ্গেই বাংলার নিকটতম সম্বন্ধ – তাতে 'জ'–র স্থানে 'য' হয়। সুতরাং পুরণো পুঁথিতে যে এসব স্থলে কোথাও কোথাও 'জ; দেখা যায়, তা প্রাকৃত প্রয়োগের অনুসরণে হয় নি, নেহাৎ অজ্ঞতা বা অসাবধানতার জন্যেই হয়েছে, এবং সেগুলি ভুলই। তারপর, প্রাকৃত ত খুব বলছেন। তখন 'ণ' বাতিল করে 'রাণী' 'কাণ' সোণা'তে 'ন' বসাতে যান, তখন ত কৈ প্রাকৃতের কথা আপনাদের স্মরণ থাকে না? শুধু এক পৈশাচী প্রাকৃতে ছাড়া, আর কোন প্রাকৃতেই যে 'ন' একদম নেই, একেবারেই 'ণ'–এর রাজত্ব। এই কথায় রাজশেখরবাবু ছোট্ট একটু প্রশ্ন করলেন, ''দেব বাবু, প্রাকৃত কি অনেক রকম আছে নাকি?''

বানান –কমিটির সভাপতির মুখে এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি অবাক।

আমিও সংক্ষেপে বলিলাম, ''হ্যাঁ, সাহিত্যে ব্যবহৃতই ত চার রকম প্রাকৃত পাওয়া যায়, তাছাড়া মৌখিক ব্যবহার ত কতই আছে।''

দেবপ্রসাদ ঘোষ

BANGODARSHAN.COM

***** ‘অবসর’ সংস্থার সমাজ ও সংস্কৃতি বিভাগের দুটি প্রবন্ধকে সামান্য পরিমার্জিত করে এই উপস্থাপনা।